Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবুল হুসেনের ছোটগল্প

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. মুস্তাফিজুর রহমান
Published online	February 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.5
Pages	77-88
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবুল হুসেনের ছোটগল্প

মো. মুস্তাফিজুর রহমান

আবুল হুসেন একজন কর্মমুখর ব্যক্তিত্ব। তাঁর কর্মমুখরতা ছিল বিচিত্র পথগামী। সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অস্থির, অক্লান্ত পদচারণা। এসব কিছুর মূলে ছিল তাঁর সংবেদনশীল অন্তর এবং জাতীয় ও মানবিক কল্যাণবোধ। এর নিয়ন্ত্রণীশক্তি হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোজগৎ। শিল্পী বা কর্মীর মনোজগৎ আকাশচারী বা কল্পলোকের বায়বীর কোন পদার্থ নয়, বস্তুলোকের অভিঘাতেই তা গড়ে ওঠে। অতএব শিল্পীর মনোজগৎ আর বস্তুজগৎ দেশকাল পটভূমির উপর নির্ভরশীল। এ কারণে আবুল হুসেনের সাহিত্যকর্ম মূল্যায়নের পূর্বে সমকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১৮৯৭ সালের ৬ই জানুয়ারী যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে আবুল হুসেনের জন্ম।[১] মাতার নাম আছিরুন্নেসা এবং মাতামহ মীর লুৎফে আলী। পানিসারা আবুল হুসেনের মাতুলালয়। তাঁর পিত্রালয় হলো যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাভুক্ত কাউরিয়া গ্রামে। আবুল হুসেনের পিতা হাজী মুহম্মদ মুসা ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ আলেম। হাজী সাহেব একখানা 'নামাজশিক্ষা' পুস্তক রচনা করেন।[২] পুস্তকখানি সমকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আবুল হুসেনের পিতামহ মৌলবী মোহাম্মদ হাশিমও ছিলেন জ্ঞানসাধক ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয়। পিতামহের ও পিতৃপুরুষের আদর্শ আবুল হুসেনের ব্যক্তিচেতনাকে আলোকিত করেছিল।

মাতুলালয় পানিসারা গ্রামে পাঠশালায় আবুল হুসেনের শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। অতঃপর পিত্রালয়ে এসে তিনি ঝিকরগাছা এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন। এখানে কিছুকাল পড়াশুনার পর তিনি যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র হন এবং এখান থেকে ১৯১৪ সালে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন।[৩] কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ. পাশ করেন বৃত্তি পেয়ে। ১৯২০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে

এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন।[৪] আবুল হুসেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনের প্রতিটি স্তরে বৃত্তিলাভ এবং পদক প্রাপ্তি তার প্রমাণ।

তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন কলিকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষকরূপে। এরপর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন।[৫] ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। অধ্যাপনা কালেই বি. এল. এবং পরে এম. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এম. এল. ডিগ্রী অর্জন করেন।[৬] পরবর্তীকালে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে আইন পেশায় যোগ দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Tagore Law Lecturer পদের জন্য The History of Muslim Law in British India বিষয়ে তিনি পনেরটি বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ দাখিল করেন। এতে বিধৃত রয়েছে তাঁর মৌলিক গবেষণার পরিচয়। শুধু তাই নয়, তিনি দেশের বিভিন্ন আইন সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং প্রচলিত আইনসমূহ সংস্কার করে জনহিতকর নতুন আইনের খসড়া তৈরী করেছেন। এগুলির মধ্যে 'ওয়াক্‌ফ' আইন অন্যতম।[৭]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য শুরু হয় দেশব্যাপী আন্দোলন।[৮] এই আন্দোলনে হিন্দুরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন এবং বিক্ষোভের কাছে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। ফলে ১৯১১ সালে তৎকালীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গ ভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেন।[৯] এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ প্রতিক্রিয়া সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা যায়। মুসলিম সাহিত্যিকদের বেশ একটি অংশ এই প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আকবর উদ্দীন প্রমুখ মুসলিম লেখক স্বতন্ত্র ধারায় মুসলিম জীবনাদর্শভিত্তিক সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এর ভেতর দিয়ে প্রাধান্য পায় তাঁদের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনের পথনির্দেশনার আকাঙ্ক্ষা।

অপরদিকে চলতে থাকে খেলাফত আন্দোলন। এই ভাবতরঙ্গ আছড়ে পড়ে মুসলিম যুবশক্তির মানসতটে। খেলাফত আন্দোলনের মূলবাণী ছিল এদেশে হিন্দু-মুসলিম মিলনকামনা—কোন বিরোধ নয়, কোন সংঘাত

নয়, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গড়ে উঠবে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা। এই ঐকমত্য যাঁদের স্পর্শ করেছিল, তাঁদের মধ্যে আবুল হুসেন ছিলেন অন্যতম।

আবুল হুসেন ও তাঁর সহযাত্রীরা মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করেছিলেন। কারণ পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজ অগ্রসর না হলে এবং হিন্দু সমাজের সাথে অসমতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে, উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব নয়। আবুল হুসেনের মিলনকামী মনোভঙ্গির পরিচয় বিধৃত রয়েছে 'প্রীতির কুঁড়ি' ছোটগল্পে, 'মিলনমংগল' নাটকে এবং শিক্ষা ও রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধমালায়।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। আবুল হুসেন সেই বছরই ম্যাট্রিক পাশ করলেন। এ সময় দেশের রাজনৈতিক কার্যপ্রবাহ, যুদ্ধজাত সংকট ও প্রতিক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৯১৬ সালে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভেতরে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এটা হলো হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বেদনাদায়ক ইতিহাসে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ নজীর।[১০] ভারতের হিন্দু-মুসলিম শক্তিকে একতাবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে মহাত্মা গান্ধী খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দেন। এই দুটি আদর্শ আবুল হুসেনের মানসলোকে প্রেরণা সঞ্চার করে।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটি নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমবিকশিত হচ্ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে অংগীকার করে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠা করলো মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং প্রকাশ করলো মুখপত্র 'শিখা'। সাহিত্যসমাজের আদর্শ ছিল, চিন্তা-চর্চা, জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগসাধন। 'শিখা' পত্রিকার শীর্ষে মুদ্রিত হতো : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"[১১] মুসলিম সাহিত্য সমাজ পরিচালনায় ও 'শিখা' পত্রিকা সম্পাদনায় আবুল হুসেন বেশ কিছুকাল মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর প্রায় সকল রচনাতেই এ মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তা-চর্চার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

সমকালে পর্দাপ্রথার শৃংখলে গোটা মুসলিম সমাজ ছিল অবরুদ্ধ। সাহিত্য-সমাজ পন্থীরা ছিলেন এই অবরোধ প্রথার ঘোরতর বিরোধী।[১২] এই সমাজের তরুণকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে 'আলমামুন ক্লাব' এবং 'এন্টী পর্দালীগ' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩] তৎকালে একমাত্র বাঙালি মুসলমান মেয়ে ফজিলাতুন্নেসা পর্দার সীমানা অতিক্রম করে গণিতশাস্ত্রে এম. এ. পড়ছিলেন। 'এন্টী পর্দালীগের' এক বিশেষ সভায় ফজিলাতুন্নেসাকে জানানো হয় অভিনন্দন।[১৪] পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি, এর শ্বাস রোধকর পরিস্থিতি এবং বেদনাময় পরিণতি আবুল হুসেনের একটি ছোটগল্পের পটভূমি নির্মাণ করেছে। গল্পটি হলো 'রুদ্ধ ব্যথা'। তাঁর 'নিষেধের বিড়ম্বনা' ও 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধেও পর্দা-প্রথার প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছে।

মুক্তবুদ্ধিচর্চার মাধ্যমে আবুল হুসেন মুসলমানদের অতীতমুখীনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে একটি যুক্তিনিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে তাঁর কর্মপ্রবাহ ছিল ক্লান্তিহীন। 'বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা', 'আদেশের নিগ্রহ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা' এবং মুসলিম কালচার সম্পর্কিত লেখাগুলি আবুল হুসেনের এই কর্মনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে বাঙালির মানসতটে আছড়ে পড়েছিল রুশ বলশেভিক বিপ্লবের তীব্র ভাবাবেগ। এই ভাবতরঙ্গ আবুল হুসেনকেও নাড়া দিয়েছিল। ফলে 'বাংলার বল্‌শী', 'কৃষকের আর্ত-নাদ', 'কৃষকের দুর্দশা' ও 'কৃষিবিপ্লবের সূচনা' ইত্যাদি প্রবন্ধ রচনায় তিনি প্রবল প্রেরণা লাভ করেন।

রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর বোধ ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। দি মুসলমান, মুসলিম স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায় ইবনে মুসা ছদ্মনামে রাজনীতি-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৩১ সালে "আমাদের রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনার সময় থেকে তিনি প্রকাশ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন।[১৫] ১৯৩২-৩৩ সালে যশোর জেলা বোর্ডের নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের দলের এক মনোনীত প্রার্থী ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ফলে তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন।

আবুল হুসেনের মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং আন্দোলন নির্দ্বন্দ্ব ছিল না। নানা প্রতিকূলতা এর গতিরোধ করতে চেয়েছে। রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি ঢাকার নবাব বাড়ীতে তিনি লাঞ্ছিত হন। মোহাম্মাদী ও সোলতান পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সবকিছুর ভেতরেও আবুল হুসেন ছিলেন আশাবাদী এবং কর্মতৎপর।

সকল কর্মনিষ্ঠা, মুক্তবুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অসীম উজ্জ্বলতায় বিধৃত হয়ে আছে আবুল হুসেনের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মে।

২.

বাঙালি মুসলমান সমাজের বিচিত্রমুখী সমস্যা আবুল হুসেনের গল্পসমষ্টির বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছে।[১৬] এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী গল্প 'মিনি'।

মুসলিম সমাজের একটি নিদারুণ সমস্যা 'রুদ্ধ ব্যথা' গল্পের উপজীব্য। কঠোর পর্দাপ্রথার মর্মান্তিক ও বেদনাময় দিক উন্মোচনই গল্পকারের অভীষ্ট লক্ষ্য। বড়ুর জীবনের বেদনা, হাহাকার ও করুণ পরিণতির ভেতর দিয়েই এই সমাজসত্য হয়েছে আলোকিত।

বড়ুর জীবনবেদনা ও পরিণতি রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পটিকে স্মরণ করায়। দুটি গল্পই সমাজিক সমস্যাভিত্তিক। অবশ্য গল্প দুটির মধ্যে পার্থক্য যে নেই তা নয়। 'হৈমন্তী' গল্প হিন্দুসমাজে এবং 'রুদ্ধ ব্যথা' গল্প মুসলিম সমাজের চিত্র নির্মাণ করেছে। হৈমন্তী গল্পের বিষয়বস্তু যৌতুক-প্রথা আর রুদ্ধ ব্যথা গল্পের বিষয়বস্তু হলো পর্দাপ্রথা। তবে 'হৈমন্তী' গল্পটি নিঃসন্দেহে অধিকতর শিল্পিত সৃষ্টি।

আবুল ফজলের 'শরীফ' গল্পটির সাথে 'রুদ্ধ ব্যথা' গল্পের বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় গল্পে পর্দাপ্রথার কঠোরতা ও বেদনাময় পরিণতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'শরীফ' গল্প অপেক্ষা রুদ্ধ ব্যথা গল্পে প্লট নির্মাণের শৃংখলা অধিক বলে মনে হয়। তবুও শৈল্পিক উপস্থাপনায় 'শরীফ' রুদ্ধ ব্যথাকে অতিক্রম করেছে।

চরিত্র নির্মাণে গল্পকার বড়ুর প্রতি সর্বাধিক মাত্রায় অভিনিবেশী ছিলেন। কারণ লেখকের সমাজ-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে বড়ুর মাধ্যমে। প্রাক্-বিবাহকালীন বড়ু চরিত্রের বিকাশ যতটা সাবলীল হয়েছে, তারপর অবরুদ্ধ

পারিবারিক শৃংখলে তা হয়েছে ততটা ব্যাহত। বড়ুর ভেতরে একটা বিক্ষোভ আছে, কিন্তু তার প্রকাশ নেই। এই অপ্রকাশ্য বিক্ষোভ গল্পের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> তাহার অন্তরের ভিতরকার অশান্তি প্রকাশের অভাবে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে চাহিত কিন্তু সমাজ ও লৌকিক আচারের চোখ রাঙ্গানিতে সে থামিয়া থাকিত—তবু রুদ্ধ-বেদনার জ্বলন্ত আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া তুষের আগুনের মতো নীরবে তাহার ভিতরটা খাইয়া ফেলিতে ছাড়িল না। কিন্তু অন্তরের অবস্থা অন্তরেই রহিয়া গেল।[১৭]

সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর বেশী সম্ভবও নয়। এদিক দিয়ে চরিত্রটি স্বাভাবিক। এই বিক্ষোভ আরও ব্যঞ্জনাময় এবং আরও ইঙ্গিতময় করতে পারলে ভালো হতো।

মালেক মিয়া লেখকের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। চরিত্রটির অন্যান্য আচরণ অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু হৃদয়বৃত্তিতে সে হয়ে উঠেছে প্রস্তর-কঠিন। নির্মম প্রকৃতির লোক সমাজে দুর্লক্ষ্য নয়। তাই বলে এতটা মমতাহীনতা অস্বাভাবিক। কোমলতা ও নির্মমতা মিশিয়ে নির্মিত হলে চরিত্রটি পুরোপুরি বিশ্বস্ত হতে পারতো। সমাজ ভাবনায় গল্পটি সার্থক, যদিও তা শিল্পিত সৃষ্টি হতে পারেনি।

'নেশার ফের' গল্পটির নির্মাণকৌশল 'রুদ্ধ ব্যথা'র চেয়ে প্রাগ্রসর। এখানে নাটকের মতো কাহিনী একের পর এক হয়েছে দৃশ্যান্তরিত। সহজ সরল ভঙ্গি এবং সাবলীল গতিতে এর প্লট হয়ে উঠেছে পরিণতিগামী।

অশিক্ষা ও অজ্ঞানতা মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা। অশিক্ষায় মুসলিম সমাজের কিভাবে স্খলন ঘটেছে তার একটি বাস্তবচিত্র নির্মিত হয়েছে এ-গল্পে। গল্পটির পরিসর সংক্ষিপ্ত। তবুও জমিলা ও জৈনদ্দীন লেখকের সমান মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। জৈনদ্দীন নেশামত্ত হলেও বিবেকবর্জিত নয়। নেশার প্রবল আকর্ষণ, বড় হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ও স্ত্রীর প্রতি প্রেমবোধ সব মিলিয়ে জৈনদ্দীন একটি বিশ্বস্ত চরিত্র। জমিলা প্রেমে-ভালোবাসায় অবিশ্বস্ত নয়। কিন্তু গল্পের শেষাংশে তার ব্যক্তিক দৌর্বল্য লক্ষণীয়। যে স্বামী তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলো তার প্রতি অতিক্রান্ত অক্লেশে ক্ষমা প্রদর্শনে চরিত্রটি একটু অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ মুসলিম সমাজ 'স্নেহের টান' গল্পের পটভূমি নির্মাণ করেছে। যদিও এ গল্প একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তবুও এর ভেতরে মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র সুস্পষ্ট।

এক বিধবার দুই পুত্র দেলা ও ছলের দারিদ্র্যদীর্ণ জীবনচিত্র 'স্নেহের টান' ছোট গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। দুই ভাই-এর দারিদ্র্যের কারণ তাদের অন্তঃসারশূন্য বংশ মর্যাদা, অশিক্ষা ও ভ্রাতৃ-অনৈক্য।[১৮] একথা গল্পকার স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন—

> জমাজমি বিদ্যাবুদ্ধি যাহার বলে মানুষ বাঁচিয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র বিধবার বাচ্চা দু'টির ছিলনা। শারীরিক পরিশ্রম? কি পরিশ্রম? নাঙ্গল, তা ধরিতে পারিবে না—নিড়ানী কিংবা কোদাল হাতে করিলে অপমান হইবে। তাহারা যে মানী মীর বংশের ছেলে।[১৯]

অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন কাটতে থাকে। দেলার বিয়ের পর ছলে সংসার পৃথক করে নিলো। ফলে সাংসারিক অবস্থার ঘটলো আরও অবনতি। পরিশেষে মৃত্যুপথযাত্রী ছলের আর্তনাদ, "ভাই আর আলাদা হইবে না—তুমি যে আমার ভাই মার পেটের।"—এই শেষ সংলাপটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে। এটা যে কেবল ছলের চরিত্র রূপান্তরের ইঙ্গিত বহন করে তাই নয়, একদিকে যেমন অন্তর্নিহিত স্নেহসূত্র আবিষ্কার করে, অপরদিকে তেমনি ভ্রাতৃ-ঐক্য প্রতিষ্ঠারও নির্দেশনা দেয়। দারিদ্র্যদীর্ণ জীবনের করুণচিত্র পাঠক-মনকে নাড়া দিলেও এ গল্পের নির্মাণ-কৌশল আর অগ্রসর হয়নি।

আগেও বলেছি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে 'মিনি' গল্পটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। কোন সমাজভাবনা কিংবা কোন সামাজিক সমস্যা এ গল্পের প্রতিপাদ্য নয়।[২০] হৃদয়বৃত্তির গভীরে লালিত স্নেহশৃংখল আবিষ্কারই ছিল লেখকের অভিপ্রায়। এদিক থেকে গল্পটি সার্থক।

মিনিকে কেন্দ্র করেই গল্পটি গড়ে উঠেছে। অথচ মিনি একটি বিড়ালের নাম। গৃহপালিত প্রাণী নিয়ে গল্পরচনা এটাই প্রথম নয়। অমর কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রকেও এ পথে হাঁটতে দেখেছি। 'মহেশ' গল্পটি তার প্রমাণ। মহেশ গল্পের সাথে 'মিনি' গল্পের পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। এ পার্থক্য

কেবল প্রাণিগত নয়, তা গল্পের অন্তরধর্মেও নিহিত। ফসল উৎপাদনের সহ-যোগী হিসেবে মহেশের প্রতি ছিল গফুরের অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং মমতা। মিনি ও জামিলার মধ্যে কোন কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়াই গড়ে উঠেছে গভীর এবং নিবিড় মমতাবন্ধন। মহেশ ও গফুরের মমতা একপক্ষীয় কিন্তু মিনি ও জামিলার মমতা উভয়পক্ষীয়, পরস্পর। তাই মিনি পালিকা মৃত জামিলার পদাঙ্কগামী হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী জামিলার সজীব স্মৃতিবহ হিসেবে নূরের মনকেও ছুঁয়ে যায় মিনি। তবে উভয় গল্পে স্নেহমমতার অনুভূতির ভেতরে কোন কৃত্রিমতা নেই।

জামিলার আকস্মিক মৃত্যুতে অবলা প্রাণী মিনির গভীর আকূতি পেয়েছে অন্তরস্পর্শী শব্দরূপ :

> মিনি অবলা। তাহার খাওয়া নাই ঘুম নাই। সে আর নূরের কাছে আসে না। দরজা খোলা পাইলে সে দৌড়িয়া যে পথে জামিলার দেহ গিয়াছিল সেই পথে গিয়া কি এক লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত।[২১]

কেবল তাই নয়, মিনি নূরের অন্তরকেও দোলা দিয়ে যায় মমতার গভীর স্পর্শে : "জামিলার স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল ঐ মিনি। মিনিকে দেখিলে নূরের বুকের উপর দিয়া অশ্রুস্রোত বাইয়া চলিত। মিনির প্রতি শিরায় শিরায় অঙ্গে অঙ্গে জামিলার স্মৃতি বিজড়িত। জামিলা টুকটুকে নখ দিয়া মিনির মাথা চুলকাইয়া দিত। সুগোল সুকোমল বাহুবেষ্টনে মিনিকে সোহাগ করিত, স্থির চঞ্চল চক্র দিয়া মিনিকে লইয়া কত খেলা করিত। নূরের মানসপটে এইসব ছবি অবিকল উঠিয়া ঝলমল করিত আর নূরের জানটা যেন ভাংগিয়া খান খান হইয়া পড়িত।"[২২]

গল্পের শেষাংশে লেখক একটি নাটকীয় অনুভূতিময় মুহূর্তের অবতারণা করেছেন : "মিনি! মিনি নড়েওনা, চড়েওনা, মুখও তুলেনা। চির নিদ্রামগ্নের মতো স্থির শীতল ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। নূর চকিতে জামিলার কবরের উপর হইতে মিনির মৃত দেহ কোলে ও বুকে তুলিল—তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল—শ্বাসরোধ হইয়া আসিল।"[২৩]

এ গল্পে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গল্পের ক্ষেত্রে সমাজভাবনা রূপায়ণ অপেক্ষা আবুল হুসেন শিল্পরস নির্মাণে অধিক মনোযোগী।

পরিবেশনার ক্ষেত্রে 'গোঁয়ার গাদু' গল্পে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এখানে সংলাপ অপেক্ষা বর্ণনার প্রাধান্য অধিক। বিস্তৃত বর্ণনাকৌশল 'গোঁয়ার গাদু'কে ছোটগল্পের কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে। বরং তা একে অনেকাংশে উপন্যাসের নিকটবর্তী করেছে।

গল্পের ঘটনাংশ শহর ছেড়ে যখন পল্লীর ছায়ালোকে অবতরণ করেছে তখন বেশ কিছু গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, হুড়া, তাউত, নাল ইত্যাদি। এটা জীবন অনুগামী হয়ে উঠেছে।

রহমউদ্দীন ওরফে গাদু এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গাদু আশৈশব গোঁয়ার এবং ডানপিটে ছেল। সে নয় বছর বয়সে পিতা এবং আঠার বছরে মাকে হারায়। পিতৃমাতৃহীন গাদু আরও উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে। এভাবে কেটে যায় আরও চার-পাঁচ বছর। একদা পিতৃ-সমাধি দর্শনে ও পিতৃ-স্মৃতির স্পর্শে গাদুর ভেতরে আসে রূপান্তর। এই রূপান্তর তার চরিত্রের অপর মেরুকে উন্মোচিত করে। এরপর থেকে সে হয়ে ওঠে পরম পরোপকারী। আর্ত-পীড়িতকে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সেবা করতে গিয়ে নিজেও রোগাক্রান্ত হয়। অবশেষে তাকে অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়।

বিবর্তনময় চরিত্র নির্মাণের প্রয়াস এ গল্পে পুরোপুরি সফল হয়নি। কার্যকারণ সূত্র নির্দেশ সত্ত্বেও গাদু চরিত্রের বিবর্তন অনেকাংশে আকস্মিকতায় পরিণত হয়েছে।

গল্পে লেখকের আসল অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে গাদুর ভাবনার ভেতরে। মুচীর শিশুকন্যা চিকিৎসায় ডাক্তারের অসম্মতি গাদুকে ভাবিয়েছে:

> বিশ্বপিতার যে জলবায়ু সেবন করিয়া ডাক্তারও মানুষ, মুচীও সেই জলবায়ু সেবন করিয়া মানুষ হইয়াছে। বিশ্বপিতা ডাক্তারকে যতখানি দিতেছেন, মুচীকেও ততখানি দিয়াছেন—কাহাকেও কমবেশী করেন নাই—তাহার নজরে মুচী ও ডাক্তার সমান। তবে কেন ডাক্তার মুচীকে চিকিৎসা করে না। এই অসমতাটা গোঁয়ার গাদু কিছুতেই বুঝিতে পারে না।[২৪]

এ ভাবনা নিরক্ষর গাদুর চরিত্র অনুসারী নয়। এ প্রসংগে গল্পকারের দেয়া ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয়নি। তবুও এ গল্পে মনুষ্যত্বের যে মহিমা

কীর্তিত হয়েছে তা অবশ্যই সন্তোষজনক। এর ভেতর দিয়ে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে লেখক সমাজের মুক্তি কামনা করেছেন।[২৫]

আবুল হুসেনের গল্প-চর্চার ধারায় 'প্রীতির কুঁড়ি' অনেকাংশে শিল্প-সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে। লেখকের বক্তব্য এখানে বেশ কিছুটা শিল্পিত হতে চেয়েছে।

পূর্ববর্তী 'গোঁয়ার গাদু' গল্পের শেষাংশ অবতরণ করেছিল গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। এগল্পে পল্লী পরিবেশের প্রভাব আরও গভীর। প্রকৃতি বর্ণনায় গল্পটি হয়ে উঠেছে সজীব এবং প্রাণময়—যা আবুল হুসেনের আর কোন গল্পে পরিলক্ষিত হয়নি। 'গোঁয়ার গাদু'র তুলনায় এখানে আঞ্চলিক শব্দ আরও বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে তা গল্পের পরিবেশ নির্মাণে হয়েছে সহায়ক। গল্পটির কেন্দ্রস্থলে নাজেমের অবস্থান। তার বালক মনের উন্মেষ ও বিকাশ বর্ণনায় লেখকের দক্ষতার পরিচয় মেলে।

এ-গল্প লেখকের একটি বিশেষ মানস-প্রবণতার চিহ্ন বহন করে। এই প্রবণতার দু'টি প্রান্ত। একটি হলো সমাজবক্ষ থেকে অস্পৃশ্যতামুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অপরটি হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবোধ। অস্পৃশ্যতামুক্তির অভিপ্রায় পূর্ববর্তী 'গোঁয়ার গাদু' গল্পেও বিধৃত হয়েছিল। কিন্তু এ-গল্পে তার সাথে যুক্ত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবোধ। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল আবুল হুসেনের অন্যতম ব্রত। লেখক এই ঐক্যবোধের শিল্পরূপ নির্মাণ করতে চেয়েছেন এই গল্পে—

"একদিন বুড়ি নাজুর পিতাকে ডাকাইয়া নাজু ও তাহার পিতাকে তাহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখুন, বাছা নাজেম আমার অবনীর তুল্য। আপনিও আত্মীয়ের মতো আমার অসময়ে কাজে লাগিয়াছেন। আপনি মুসলমান, কিন্তু বিশ্বজনীনতার বিশালতায় আপনার আত্মপ্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। তাই আপনি অসহায়া হিন্দু বিধবার বক্ষের বেদনা মুছাইতে জীবনের রক্ত আপনার বাছাকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছেন। ভগবান আপনাকে ও আপনার বাছাকে চির শুভ-মংগলে পরিপূর্ণ করিবেন। আপনি যথেষ্ট করিলেন, এখন আপনার নিকট একটা শেষ প্রার্থনা করিতে...

নাজুর পিতা চকিতে বাধা দিয়া গদ গদ হইয়া বলিলেন, "কি বলুন, আপনাকে এমন কি করিয়াছি যে, আপনি এত বেশী বলিতেছেন? আপনার যাহা ইচ্ছা বলুন, আমি প্রাণ দিয়া তাহা সম্পাদন করিব।"[২৬]

মুসলিম সমাজের সংকট ও অবনতি এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবোধ আবুল হুসেনের গল্পগুলিতে তরঙ্গায়িত হয়েছে একাধিকবার। তবে শিল্পসৃষ্টির পূর্ণবিকাশ ও পরিণতি সম্ভব হয়নি। কারণ গল্পচর্চায় শিল্প সম্ভাবনার যে কুঁড়িটি ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশের আগেই আবুল হুসেনের অকাল প্রয়াণে, তা থেকেছে খণ্ডিত, পূর্ণতা পায়নি।

তথ্য-নির্দেশ

১ আবদুল কাদির (সম্পাদিত) : আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, (ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৬), পৃ. ১১

২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩ খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৯৪

৪ আবদুল কাদির : পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১২

৫ খোন্দকার সিরাজুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪

৭ আবুল ফজল : বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও আবুল হুসেন (নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ২০২

৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চট্টগ্রাম, বইঘর, ১৯৬৮), পৃ. ১৫

৯ কমরুদ্দীন আহমদ : পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকা, স্টুডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৩৭৬), পৃ. ৭

১০ কমরুদ্দীন আহমদ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১১ আবদুল কাদির : পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১২ আবদুল হক : ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" (সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ, ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ. ১৫২

১৩ আবুল ফজল : বুদ্ধির মুক্তিবাদ ও আবুল হুসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

১৫ আবদুল কাদির : পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৬ খোন্দকার সিরাজুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৫

১৭ 'রুদ্ধ ব্যথা', আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩

১৮ খোন্দকার সিরাজুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬

১৯ 'স্নেহের টান', আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২০ খোন্দকার সিরাজুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭
২১ 'মিনি', আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫
২২ পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৫৫
২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭
২৪ গোঁয়ার গাদু, আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬
২৫ খোন্দকার সিরাজুল হক : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭
২৬ 'প্রীতির কুঁড়ি', আবুল হুসেনের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫